কফিনের জানাজা

আকিল মাহমুদ

সাগরিকা প্রকাশনী

কফিনের জানাজা
আকিল মাহমুদ

প্রকাশকাল
অক্টোবর, ২০২৬

প্রকাশক
চাষী এসকে খান
সাগরিকা প্রকাশনী
গাজীপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর, বাংলাদেশ।
মোবাইল: ০১৭৩১-৫৬৪১৬৪, Email: sagorikaprokasoni@gmail.com

বর্ণবিন্যাস
কবির কম্পিউটার
প্রচ্ছদ
চাষী এস,কে খান

মুদ্রণে
সাগরিকা প্রিন্টার্স
২৮/১, রূপচাঁদ লেন, ঢাকা- ১১০০

মূল্যঃ ৩২০.০০ টাকা

ISBN: 978-984-29056-9-6

উৎসর্গ

“ধুলোয় মিশে থাকা নামহীন প্রাণীসত্তা,
যার খুনি আমি এবং আমার যান্ত্রিক শহর”

কতো ঘৃণা অই চোখে—
কতো অবিশ্বাস অই মনে—
কার স্মৃতি করো খেলা নিশিদিন-বিষন্ন বেলায়
আনমনে অকারণে বৈরি অবহেলায়।

শাকিল মা'মুদ

লেখকের কথা

গত কয়েকদিন ধরে ঘটে যাওয়া প্রতিটি অদ্ভুত ঘটনা, ঝাউতলার সেই নিস্তব্ধ আড্ডা। মৃন্ময়ীর শরীর হুট করে শুকিয়ে যাওয়া, খাদেম সাহেবের সেই মরণ ঘন্টার মতো সতর্কবাণী, পাগলির কর্কশ হাসি আর সেই কালো বিড়ালের জ্বলন্ত চোখ-সবকিছু সে একনাগাড়ে বলে গেল, যেন কেউ তার গলা টিপে এখনি হত্যা করবে আর শেষবারের মতো সে কথা বলার সুযোগ পেলো।

'ঠাস' 'ঠাস'—দুটো গুলির শব্দ।

রাত আড়াইটার কল যেন অলিখিত মৃত্যুপরোয়ানা।মৃগেল যখন পাগলের মতো ছুটছে,তখন সে লক্ষ্যভেদী এক মিসাইল আর মৃন্ময়ী দু'হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাক আত্মসমর্পণকারী এক শহর।

এই সমর্পণ কি ভালোবাসার নাকি কোন আসন্ন বিয়োগান্তক পরিণতির?

জীবন মৃত্যুর মনস্তাত্ত্বিক হাহাকার আপনাকে নিয়ে যাবে রুদ্ধশ্বাস গন্তব্যে।

এই রহস্য উন্মোচন হবে 'কফিনের জানাজা'—প্রতিটি পাতায়।

■এক

কুকুরের বাচ্চা গুলো দিব্যি ভালো আছে।নিয়মিত নিয়ম করে খুঁজ নেওয়ার মানুষের অভাব নেই। মা না থাকলেও একপ্রকার অঘোষিত মা হয়ে উঠেছে মৃন্ময়ী। নিজের সন্তানের মতো করে টিনকু, ছিনকু, রিনকু'কে বড়সড় করতে ব্যস্ত। মিনকু আর বেঁচে নেই, মৃন্ময়ী'র সকল চেস্টাকে ব্যর্থ প্রমান করে সে চলে গিয়েছে তার মায়ের কাছে।যদিও আমরা মানুষেরা শোক কাটিয়ে উঠতে পারি খুব তাড়াতাড়ি। আর কোন কিছু পারি আর না পারি,এ-ক্ষেত্রে আমরা কম-বেশি সবাই পারদর্শী। মিনকুর মৃত্যুর পর থেকে মৃন্ময়ীর যত্ন অনেকগুন হয়ে গেল, বাকিদের প্রতি। তাদের মা-ও হয়তো উপর থেকে তাদের এমন অবস্থায় দ্যাখে বড্ড খুশি হচ্ছে। ওরা এখনো জানে না পৃথিবীটা কতটা রুক্ষ, কারণ ওদের জন্য পৃথিবী মানেই মৃন্ময়ীর হাতের স্পর্শ আর উষ্ণ দুধের ঘ্রাণ। মাসখানেক আগে ওদের মা যখন এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেল, তখন মৃন্ময়ী পাগলের মতো ছুটে গিয়েছিল। মা কুকুরটাকে বাঁচাতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু কালভার্টের নিচে কুঁকড়ে থাকা চার জোড়া অসহায় চোখ তাকে স্থির থাকতে দেয়নি। সেই থেকে মৃন্ময়ী ওদের অঘোষিত মা। মৃন্ময়ী যখন ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, টিনকু সবার আগে লেজ নাড়িয়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দেয়। ছিনকু আর রিনকু তখনো হয়তো ঘুমের আমেজে থাকে। মৃন্ময়ী পরম মমতায় ওদের গায়ে হাত বুলায়। এই শহর হয়তো নিষ্ঠুর, কিন্তু এই তিনটি প্রাণীর কাছে মৃন্ময়ীই বিধাতার

পাঠানো একমাত্র আশীর্বাদ। এখন নিয়ম করে খোঁজ নেওয়াটা আর কেবল শখ নেই, বরং এক অলিখিত বাধ্যতামূলক ডিউটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মৃন্ময়ীর এই যত্নের সাক্ষী হয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে লম্বাটে করে ছেলেটা।ছেলেটা অদ্ভুত, মানুষের সাথে মিশতে সাবলীল হলেও চারপেয়ে প্রাণীদের দেখলে তার আত্মা শুকিয়ে যায়। সে কুকুরের বাচ্চা হোক কিংবা কাল্পনিক ডাইনোসর—ভয় তার চিরসঙ্গী। ছেলেটার নাম মৃগেল। ওদের যখন মৃন্ময়ী খেতে দেয়,তখন অন্তত দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে দাঁত খিলখিল করে হাসে। মৃন্ময়ী ধমক দিয়ে বলে, "হাসছিস কেন? একটু আদর করলে কী হয়?"

মৃগেল মাথা নেড়ে পিছিয়ে যায়—

"না বাবা, আমার এই দূর থেকেই ভালো। তোর এই বিচিত্র সব রান্নাবান্না আর আদর ওরাই হজম করতে পারে।" মৃন্ময়ী মুচকি হেসে নিজের কাজে মন দেয়। সে চায় তার অনুপস্থিতিতেও যেন কেউ এই অবলাদের খোঁজ নেয়। তাই সে জোর করে মৃগেলকে সাথে নিয়ে আসে। মাঝেমধ্যে মৃগেলকে একা একা পাঠায়, শুধু এটা নিশ্চিত করতে যে ওরা ঠিক আছে কি না। মৃগেল ভয়ে ভয়ে গিয়ে দূর থেকে দেখে আসে, তারপর রিপোর্ট দেয়— "তোর গুন্ডা বাহিনী একদম ফিট আছে।" ভালোবাসা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ফ্রেমে বন্দি কোনো অনুভূতি নয়। আমরা মুখে অনেক সময় সম্পর্কের জটিলতাকে 'নোংরামি' বলে আখ্যা দিই, অথচ আমাদের চারপাশেই ছড়িয়ে থাকে পবিত্রতম সব প্রেম। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেই পেঁপে গাছটি, যার দিকে

তাকিয়ে একটি ছেলে প্রতিদিন অবাক বিস্ময়ে জীবনের মানে খোঁজে—সেটিও এক গভীর প্রেম। কিংবা বেলকনিতে পানির পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকা সেই মেয়েটি, যে চাতকের মতো কোনো এক তৃষ্ণার্ত কাকের অপেক্ষা করে—সেখানেও মিশে থাকে মমতা। প্রেমে পড়া যায় গাছের ডালে ঝুলে থাকা জোড়া আমের, প্রেমে পড়া যায় হলদে হয়ে যাওয়া পুরনো চিঠির কিংবা ধুলো জমা প্রিয় কোনো বইয়ের। নিঝুম রাতে রাস্তার মোড়ে একা দাঁড়িয়ে থাকা ওই ল্যাম্পপোস্টটির সাথেও কারো কারো গভীর প্রণয় গড়ে ওঠে। আসলে আমরা মানুষেরা হয়তো ভালোবাসার ব্যাকরণ জানি না, কিন্তু আমরা অনুভব করতে জানি। ঠিক যেমন একদিনের এক নবজাতক তার কোলদাতার স্পর্শে কান্না থামিয়ে দেয়; সে জানে না 'মা' কাকে বলে, কিন্তু সে সেই মমতাকে চিনতে ভুল করে না।

ঠিক তেমনই, শহরের আশ্রয়হীন আর অবহেলিত কুকুরগুলোর প্রতি মৃন্ময়ীর যে টান, এটিও অকৃত্রিম ভালোবাসা। আর এই টান দেখে মনের ভেতর এক অদ্ভুত ভালোলাগা কাজ করে—এটাই তো ভালোবাসার। ভালোবাসা কোনো বিশেষ সংজ্ঞায় বাঁধে না; ভালোবাসা বাঁচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মায়ায় আর নিঃস্বার্থ অনুভবে।

সেদিন মৃন্ময়ীর ফোন পেয়ে মৃগেল বাস স্টেশনে গিয়ে যা দেখল, তাতে তার কলিজা কেঁপে উঠল। বাচ্চাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে চঞ্চলটার পা ভেঙে গেছে। হয়তো কোনো বাসের নিচে পড়তে গিয়েছিল কিংবা নিজেদের মধ্যে দুষ্টুমি করতে গিয়েই এই দশা। মৃগেল দূর থেকে দেখল, ব্যথায় কাতরাচ্ছে ছোট শরীরটা। সে তড়িঘড়ি করে মৃন্ময়ীকে ফোন

দিয়ে খবরটা জানাল। খবর পাওয়া মাত্রই মৃন্ময়ী সব কাজ ফেলে একপ্রকার অপ্রস্তুত হয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। তার চোখেমুখে তখন রাজ্যের দুশ্চিন্তা। মৃন্ময়ীকে দেখা মাত্রই অন্য বাচ্চাগুলো নিজেদের সব কষ্ট ভুলে মহা খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল। রীতিমতো কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেল—কে কার আগে মৃন্ময়ীর কোলে উঠবে। মৃন্ময়ী দুহাতে ওদের সামলাতে সামলাতে ভাঙা পা ওয়ালা বাচ্চাটাকে পরম মমতায় কোলে তুলে নিল। মৃগেল আগের মতোই নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখতে লাগল। তার কাছে এই ছোট প্রাণীগুলো ডাইনোসরের চেয়ে কম ভয়ের নয়, কিন্তু দৃশ্যটা কী সুন্দর! মৃন্ময়ীর কোলে উঠে ওরা যখন লেজ নাড়তে নাড়তে মৃন্ময়ীর গালে আলতো করে চুম্বন করছিল, তখন মৃগেলের মনে হলো পৃথিবীতে এর চেয়ে খাঁটি মায়া আর কিছু হতে পারে না। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো ওদের শাসন মানার ক্ষমতা। মৃন্ময়ী কঠোরভাবে হুকুম দিয়ে রেখেছে— 'যতই দুষ্টুমি করো, বাস স্টেশনের সীমানা পেরিয়ে সড়কে আসা চলবে না।'তাই মৃন্ময়ী যখন ওদের রেখে চলে আসে, ওরা পেছন পেছন আসার জন্য ছটফট করে, কিন্তু সড়কের সীমানায় এসে ঠিকই থেমে যায়। ওদের চোখে তখন এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা খেলা করে, যেন বলতে চায়—"আবার কখন আসবে?"

মৃন্ময়ী ভাঙা পা-টা নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে অঝোরে কাঁদছিল। তার এই কান্নার পেছনে শুধু মায়া নয়, বরং মিনকুকে হারানোর একটা চাপা ভয়ও মিশে ছিল। মৃগেল দেখল, মানুষ কীভাবে অন্য এক প্রজাতির প্রাণের সাথে নিজের আত্মাকে গেঁথে ফেলতে পারে। মৃগেল ধীর গলায় বলল,

"কাঁদিস না,, ও ঠিক হয়ে যাবে। দেখছিস না তোকে দেখে ব্যাথা ভুলে ও কেমন গাল চাটছে তোর?" মৃন্ময়ী চোখের জল মুছে মৃগেলের দিকে তাকাল। সেই চাহনিতে কৃতজ্ঞতা ছিল নাকি অন্য কি ছিলো তার জানা নেই। মৃন্ময়ীর বাসা কাছের কবরস্থানের পাশের কুসুম গলিতে। যদিও কাছে কিন্তু দূরত্ব সামান্য হলেও, ঘরের চার দেয়াল ডিঙিয়ে হুটহাট বেরিয়ে পড়াটা একজন নারীর কাছে আজও এক দুর্লভ বিলাসিতা। এক সমুদ্র অনুমতির পাহাড় টপকাতে টপকাতে বাইরের জগতের তেজ ম্লান হয়ে আসে; তখন মনে হয় ঘরটা যেন এক সুসজ্জিত কারাগার। তবে হ্যাঁ, বন্দি জীবনের সত্যিকারের দহন তারা হয়তো দেখেনি—যে দহনে বড় বড় অপরাধীরাও আজীবন সুপথে ফেরার পথ খোঁজে। কিন্তু জেলের কয়েদি আর ঘরের এই নারীর মধ্যে তফাত অনেক। পুরুষের কাছে ঘর যেখানে দিনভর ক্লান্তির পর আয়েশ করার রাজপ্রাসাদ, নারীর কাছে সেই ঘরই হাজারো অলিখিত দায়িত্বের এক অন্তহীন কর্মশালা। তারা জেলখানার কষ্টের সাথে পাল্লা দিতে চায় না, তারা শুধু চায় সেই সহজ স্বাধীনতা—যা একজন পুরুষকে অনায়াসে ডানা মেলতে শেখায়। তবে এই সীমাবদ্ধতা দিয়ে মেয়েদের পরিমাপ করা ভুল। তারা কোনো অংশেই পুরুষের চেয়ে কম নয়; বরং হাজারো অদৃশ্য শিকল পায়ে নিয়েও তারা যেভাবে ঘর ও বাহির সামলায়, তা পুরুষের চেয়েও বেশি মানসিক শক্তির পরিচয় দেয়। নারী মানে কেবল ত্যাগের প্রতিমূর্তি নয়, নারী মানে সেই অদম্য শক্তি—যা প্রতিকূলতাকেও হার মানাতে জানে।"
প্রতিবার মৃগেল কবরস্থান পর্যন্ত এসে মৃন্ময়ীকে এগিয়ে দিয়ে যায়।

■দুই

"স্যার, চা খাবেন? পাশের দোকানে অনেক ভালো চা হয়।" এসআই মকবুলের এই নির্বিকার প্রশ্নে মাহমুদ থমকে দাঁড়ালেন। তার পরনের ইস্ত্রি করা শার্টে এখনো ভাঁজ পড়েনি, অথচ এই এসআই-এর কলারের নোংরা আর নিস্পৃহ চাহনি তাকে রীতিমতো স্তম্ভিত করে দিল। মাহমুদের সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুরো থানার পুলিশ সদস্য। তাদের চোখেমুখে একটা অদ্ভুত জড়তা—ভয় নাকি নির্লিপ্ততা, মাহমুদ ঠিক বুঝতে পারছেন না। "চা?" মাহমুদ নিচু গলায় বললেন। তার কণ্ঠের শান্ত সুরটা যেন আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস। "মকবুল সাহেব, আপনাদের থানার ঠিক সামনে আপনাদেরই একজন অফিসারকে কিলার খুন করে উলঙ্গ করে ঝুলিয়ে দিয়ে গেল, আর আপনারা এখনো চায়ের স্বাদ নিয়ে ভাবছেন? গত সপ্তাহে এই থানার সামনে যা ঘটেছে, তা জানাজানি হলে সাধারণ মানুষ আপনাদের দিকে থুতু দেবে, সেটা কি বোঝেন?"

থানার ভেতরের পরিবেশটা মুহূর্তেই বরফ হয়ে গেল। কনস্টেবলদের মাথাগুলো আরও নিচু হয়ে এল। মাহমুদ একজন পিপিএম (রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক) প্রাপ্ত অফিসার। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বড় বড় সিন্ডিকেট গুঁড়িয়ে দেওয়া তার নেশা। কিন্তু এবারের প্রতিপক্ষ কোনো সাধারণ অপরাধী নয়; সে এক কুখ্যাত সাইকো কিলার। কাশিমপুর কারাগারের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ভেঙে সে পালিয়েছে। আর পালানোর পর তার প্রথম শিকার হলো এই থানারই আগের তদন্তকারী অফিসার। মাহমুদ

টেবিলের ওপর রাখা ফাইলটা সজোরে আছাড় মারলেন।"হেডকোয়ার্টার এই ঘটনা গোপন রেখেছে শুধু পুলিশের সম্মান বাঁচাতে। কিন্তু আপনারা? আপনারা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন? একটা জলজ্যান্ত মানুষকে খুন করে থানার সাইনবোর্ডের পাশে ঝুলিয়ে রাখা হলো, আর ডিউটি অফিসার কিছুই টের পেল না? এটা কি সিনেমা নাকি জোকস?" মাহমুদ জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাইরের আকাশটা মেঘলা। শহরটা দেখতে শান্ত মনে হলেও এর প্রতিটি অলিতে-গলিতে যেন এখন সেই সাইকো কিলারের শ্বাস প্রশ্বাস শোনা যাচ্ছে। এর আগে এই খুনি গ্রামে দু-তিনটি ঘটনা ঘটিয়েছে, কিন্তু সেগুলো সাধারণ খুন ছিল। কিন্তু এবারেরটা ছিল একটি পরিষ্কার 'মেসেজ'। আগের অফিসারকে উলঙ্গ করে ঝুলিয়ে রাখার অর্থ হলো—পুলিশ বাহিনীকে নগ্ন করা, তাদের অক্ষমতাকে উপহাস করা। মাহমুদ হেডকোয়ার্টারে জোর করে নিজের বদলি করিয়েছেন এখানে। কারণ যে অফিসার খুন হয়েছেন, তিনি মাহমুদের ব্যাচমেট এবং একজন দক্ষ সহকর্মী ছিলেন। নিজের ডেরায় এসে কেউ পুলিশের গায়ে হাত দিয়ে যাবে, এটা মাহমুদ সহ্য করতে পারছেন না। "মকবুল সাহেব," মাহমুদ ঘুরে দাঁড়ালেন। "সেই রাতের সিসিটিভি ফুটেজ কোথায়?" মকবুল ইতস্তত করে বললেন, "স্যার, ওই রাতে ঝড় ছিল। ট্রান্সফরমার ব্লাস্ট হয়ে পুরো এলাকার কারেন্ট অফ ছিল তিন ঘণ্টা। সিসিটিভি কাজ করেনি।" মাহমুদ তিক্ত হাসলেন। "বাহ! খুনি জানে কখন কারেন্ট যাবে, কখন পুলিশ ঘুমাবে। এটা কি কোনো কাকতালীয় ব্যাপার, নাকি আপনাদের ভেতরেই কেউ তাকে গাইড করছে?" মাহমুদের এই প্রশ্নে সবার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি বুঝতে পারছেন, এই রহস্যের

শিকড় অনেক গভীরে। সেই সাইকো কিলার কেবল খুনি নয়, সে একজন ধুরন্ধর শিকারী, যে কি না শিকারের মনস্তত্ত্ব জানে। থানা থেকে বেরিয়ে মাহমুদ একটু নিরিবিলিতে হাঁটতে চাইলেন। শহরটা ছোট, রাস্তাগুলো সরু। প্রতিটি গলির চায়ের দোকানে মানুষের ভিড়।কাশিমপুর থেকে পালিয়ে এই ছোট শহরে আশ্রয় নেওয়াটা কিলারের সুচিন্তিত পরিকল্পনা। এখানে পুলিশের নজরদারি কম, আর সাধারণ মানুষ সহজে ভয় পায়। হঠাৎ মাহমুদের ফোনে একটা মেসেজ এল। অচেনা নম্বর। *"স্বাগত মাহমুদ সাহেব। পিপিএম মেডেলটা কি এবার আপনার কাফনের সাথে ঝুলবে?"* মাহমুদের চোয়াল শক্ত হয়ে এল। কিলার তার নম্বর পেয়েছে, তার আগমনের খবরও জানে। তার মানে সে আশপাশেই কোথাও আছে। হয়তো এই ভিড়ের মধ্যেই কোনো এক কোণ থেকে মাহমুদকে দেখছে সে। মাহমুদ ফোনের স্ক্রিনটা বন্ধ করে পকেটে রাখলেন। তার চোখে এখন আগুনের আভা। তিনি জানেন, এই লড়াইটা কেবল আইনের নয়, এটা এখন ব্যক্তিগত ইগোর লড়াই। যে খুনি পুলিশকে নগ্ন করে উপহাস করেছে, তাকে অন্ধকার কুঠুরিতে ফেরত পাঠানোই এখন মাহমুদের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি পাশের ছোট দোকানটার দিকে তাকালেন। এসআই মকবুল ঠিকই বলেছিল, চায়ের গন্ধটা বেশ ভালো। কিন্তু মাহমুদের জিভে এখন রক্তের স্বাদ। জানাজানি হলে পুলিশের উপর আস্থা চলে যাবে বলে হেডকোয়ার্টার মুখ বন্ধ রেখেছে ঠিকই, কিন্তু মাহমুদ জানেন, সত্যিটা চাপা থাকে না। হয় কিলার মাহমুদকে শেষ করবে, নয়তো মাহমুদ এই শহরের মাটি থেকে সেই কলঙ্ক মুছে দেবেন। থানার ঘড়িতে তখন বারোটা। রোদের দেখা নেই। মাহমুদ একা একা হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের দিকে এগোতে

লাগলেন। তার মনে হলো, কেউ একজন পেছনে আসছে। জুতো ঘষার শব্দ। মাহমুদ থামলেন না, কেবল কোমরের হোলস্টারে রাখা পিস্তলটার ওপর হাত রাখলেন। বাইরে ভ্যাপসা গরম থাকলেও থানার ভেতরের পরিবেশটা যেন হঠাৎ হিমাঙ্ক ছুঁয়েছে। এসআই মকবুল থেকে শুরু করে কন্সটেবল—সবার হাঁটাচলায় এখন একটা যান্ত্রিক ক্ষিপ্রতা। কেউ টেবিলের পুরনো ধুলো ঝাড়ছে, কেউবা ফাইলের জট খুলতে ব্যস্ত। ঠিক এই মুহূর্তেই থানার সদর দরজায় এসে দাঁড়ালো মৃগেল। হাতে একটা নীল রঙের প্লাস্টিক ফোল্ডার, তাতে দিদির মোবাইল চুরির যাবতীয় নথিপত্র।

মৃগেলের পরনে সাধারণ একটা সুতির পাঞ্জাবি, চোখেমুখে কিছুটা জড়তা। কয়েকদিন আগেও সে একবার এসেছিল জিডি করতে। সেদিনকার দৃশ্যটা ছিল অন্যরকম। ডিউটি অফিসার তখন চেয়ারে হেলান দিয়ে পান চিবোচ্ছিলেন আর ল্যাপটপে সিনেমা দেখছিলেন। মৃগেলকে দেখেই বিরক্তির সুরে বলেছিলেন, "অফিসার নাই, পরে আসেন। জিডি করতে তো আর জান বের হয়ে যাচ্ছে না!" কিন্তু আজকের চিত্রটা মৃগেলকে রীতিমতো চমকে দিল। সে ভেবেছিল আজও হয়তো তাকে "তদন্তকারী অফিসার নেই" কিংবা "সার্ভার ডাউন" গোছের কোনো অজুহাত শুনতে হবে। সে ইতস্তত করে ভেতরে পা রাখতেই ডিউটি অফিসার রফিক সাহেব তটস্থ হয়ে সোজা হয়ে বসলেন। "আসসালামু আলাইকুম। কোনো সাহায্য করতে পারি?" রফিকের কণ্ঠের এই অস্বাভাবিক বিনয় শুনে মৃগেল দুই পা পিছিয়ে গেল। সে ভাবল ভুল করে অন্য কোনো দপ্তরে ঢুকে পড়ল কি